বুলেটিন নং: ২৯
বর্ষ ১০॥ সংখ্যা ৪
প্রকাশ কাল: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ৫ ॥ ৳২

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www. updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
# স্বাধিকার
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

# খাগড়াছড়িতে সেনা ও পুলিশী হয়রানি উপেক্ষা করে সমাবেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ সেনা ও পুলিশী হয়রানি উপেক্ষা করে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সমাবেশ করেছে। গত বছর জেলার মহালছড়িতে সংঘটিত সেনা ও সেটলার হামলার এক বছর পূর্তিতে ২৬ আগষ্ট স্বনির্ভর এলাকায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল থেকেই স্বনির্ভর এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতিকে ভীতিকর করে তোলা হয়। সমাবেশে লোকজন নিয়ে আসার জন্য পার্টির ভাড়া করা গাড়ি সেনা সদস্যরা পানছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে আটকায়। তারা লোকজনকে নামিয়ে চেক আপের নামে হয়রানি করে। ঐদিন ছিল বাজার বার। ইউপিডিএফ এর ভাড়া করা গাড়ি চেক করা হলেও অন্যান্য পাবলিক গাড়িগুলো চেক করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হলে সেনারা জানায় তারা গাড়ির জন্য মোবাইল কোর্ট বসিয়েছে। কিন্তু পার্টির ভাড়া করা গাড়ির চালকরা তাদের লাইসেন্স দেখালেও তাতে কোনকিছু হয়নি। কেবল সমাবেশের জন্য ভাড়া করা গাড়িগুলোই থামিয়ে চেক করা হয়। এরপর নিজেদের সমর্থকদের নিয়ে আসার জন্য পার্টির নেতৃবৃন্দ অন্য গাড়ির চালকদের অনুরোধ জানালে তাতে তারা রাজী হন। কিন্তু এটাও টের পেয়ে সেনারা তা বন্ধ করে দেয়।

কেবল খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কে নয়, সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ি শহরের দক্ষিণে বিজিতলা ও গুরগুজ্যাছড়িতে অবস্থান নেয়। তাদের ভাব সাব এমন তারা যে কোন মুহূর্তে যে কারো বাসায় তল্লাসী বা যে কাউকে গ্রেফতার করবে। এই অবস্থায় সেখান থেকে পার্টির কোন সদস্য ও সমর্থক সমাবেশে যোগ দিতে পারেনি।

সমাবেশটি হওয়ার কথা ছিল খাগড়াছড়ি বাজারের মুক্তমঞ্চে। কিন্তু সেনাবাহিনী কোন অবস্থাতেই সেখানে মিছিলটি যেতে দিতে রাজী নয়। স্বনির্ভর এলাকায় তাদের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক ও হুমকিমূলক। জেলা পরিষদের অফিস পর্যন্ত তাদের উপস্থিতি। দাঙ্গা পুলিশও মোতায়েন করা হয়। যেন সামান্য হেরফের হলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। মোটামুটি সেনা ও পুলিশ সদস্যরা স্বনির্ভর এলাকায় এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে বাজার বার হলেও লোক সমাগম ছিল অত্যন্ত কম এবং যারা বাজারে লেনদেনের জন্য এসেছিলেন তারাও দ্রুত কাজ ছেড়ে চলে যান।

এই পরিস্থিতিতে সকাল ১১টার দিকে পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিট স্বনির্ভরের বটতলায় সমাবেশ শুরু করে। সমাবেশের চারদিক পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘিরে রাখে। ইউপিডিএফ-এর সমাবেশ বানচালের ষড়যন্ত্রের যেন শেষ নেই। সভা চলার সময় জনৈক মেজর স্বনির্ভর থেকে খবংপুজ্যার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান সমাবেশ-এর মধ্য দিয়ে। এটা অন্য কিছু নয়, নিজের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে উপস্থিত সমাবেশকারীদের ফাঁদে ফেলা। অর্থাৎ উত্তেজিত হয়ে যদি সমাবশেকারীরা পুলিশ বা সেনা সদস্যদের প্রতি কোন অসংযত আচরণ করে তাহলে যাতে তারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উছিলা পেয়ে যায়। কিন্তু পার্টির নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনীকে সে সুযোগ দেননি। ফলে নেতৃবৃন্দের দুরদর্শীতা ও সংযম প্রদর্শনের ফলে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়ার সেনা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বর্তমানে খাগড়াছড়িতে দায়িত্ব পালনরত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা ও পাহাড়ি যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পার্টির খাগড়াছড়ি ইউনিটের সদস্য দেবদত্ত ত্রিপুরা।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গণবিরোধী ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। সমাবেশ পন্ড করে দেয়ার সেনা ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানিয়ে তারা বলেন, ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল হওয়া সত্ত্বেও তার নেতা কর্মিদের ওপর দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে। সভা সমাবেশ ও মিছিল মিটিং করার গণতান্ত্রিক অধিকার বুটের তলায় পিষ্ট করা হচ্ছে।

সচিব চাকমা বলেন, ইউপিডিএফ এর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পরিণাম শুভ হবে না। অতীতে কোন শক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে দমাতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। তিনি ভবিষ্যতে ইউপিডিএফ এর সমাবেশ বানচালের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার ও সেনাবাহিনীকে পরামর্শ দেন।

নেতৃবৃন্দ মহালছড়ি ঘটনার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ি করে বলেন, ঘটনার এক বছর পরও দোষী সেনা সদস্য ও সেটলারদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং কোন কোন সেনাকর্মকর্তাকে প্রমোশন দিয়ে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এখনো প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বক্তারা হামলাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ির মহালছড়ির বেশ কটি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে সেনা সদস্য ও সেটলাররা ৪ শতাধিক বাড়িঘর পুড়ে দেয়। এ হামলায় দু'জন গ্রামবাসী নিহত হন, আহত হন অনেকে। হামলাকারীরা ব্যাপক লুটতরাজ চালায় ও ৯ জন জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানি ঘটায়। এ হামলার প্রতিবাদে সে সময় দেশের সকল প্রগতিশীল মহল সোচ্চার হয়। ইউপিডিএফ ঘটনার পর ৮ সেপ্টেম্বর মহালছড়িতে এক বিশাল সমাবেশ করে। জনগণের দাবি সত্ত্বেও সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করতে ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। □

## দৃষ্টি আকর্ষণ

স্বাধিকারের সম্পাদকীয় যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ঠিকানা:
**২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯**

## "আর্মি-জেএসএস ভাই ভাই অস্ত্রসহ ধরা পড়লেও ছাড়া পাই"

গত ১২ জুলাই নান্যাচর বাজার এলাকার দুর্গমনি চাকমা, প্রলাদ চাকমা ও ডাক্তার মধু'র বাড়িতে ১২ জন জন সংহতি সমিতির সদস্য অস্ত্রসহ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু সেনা সদস্যরা তাদেরকে পুলিশের হাতে সোপর্দ না করে বরং ছেড়ে দেয়।

ধৃত জেএসএস সদস্যরা হলো ১. অমরসিং চাকমা গ্রাম কৃষ্ণমা ছড়া, ২. সিদ্ধার্থ চাকমা গ্রাম ফিরিঙ্গি পাড়া, ৩. প্রসাদ চাকমা গ্রাম কুগুর মরা, ৪. সুবেন্টু চাকমা গ্রাম গুল্যাছড়ি, ৫. রোমান্টিক চাকমা গ্রাম গুল্যাছড়ি, ৬. চিক্যমনি চাকমা গ্রাম চিল্যাতলি, ৭. সমীরণ চাকমা গ্রাম কুগুর মরা, ৮. স্বপন চাকমা গ্রাম কুগুর মরা, ৯. কিরণ ধন চাকমা গ্রাম সাপমারা ১০. রণেল চাকমা গ্রাম নান্যাচর ১১. কালাতুংগ চাকমা গ্রাম গুল্যাছড়ি ও পাপুল চাকমা গ্রাম কুগুর মরা।

ঘটনার পর জনমনে পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে যে, জেএসএস যা করছে তা সরকারের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই করছে। জনগণ এও বুঝেছে যে, সেনাবাহিনী আসলে সন্ত্রাসীদেরই বন্ধু। যারা আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করে, যারা দালাল তারাই সেনাবাহিনী ও সরকারের পরম মিত্র। এ এমন এক সত্য যা নতুন করে বোঝানোর দরকার নেই। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও সেনাবাহিনীই সন্ত্রাসী মুখোশদের সৃষ্টি করেছিল।

# ইউপিডিএফ এর বিরুদ্ধে লাগামহীন অপপ্রচার

নাট্যকলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীই যে সবার সেরা তার প্রমাণ সম্প্রতি আর এক বার পাওয়া গেল। গত ২ ও ৪ আগষ্ট সেনাসদস্যরা গরগজ্যাছড়ি থেকে ইউপিডিএফ এর দুই সদস্যকে ধরে নিয়ে আসে। গ্রেফতারের সময় এদের মধ্যে একজন সাধারণ জনগণের ধান ক্ষেতে কাজে সহযোগিতা করছিলেন। সাংগঠনিক কাজের অংশ হিসেবে ইউপিডিএফ প্রায় সময় এভাবে জনগণকে সহযোগিতা করে থাকে। তবে ইদানিং জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র লোকদের হামলা বেড়ে যাওয়ার কারণে ইউপিডিএফ জনগণকে তাদের কাজে সহযোগিতা দেয়ার মাত্রা অনেকটা কমাতে বাধ্য হয়েছে।

সেনাবাহিনী দু'জনকে গ্রেফতারের পর খাগড়াছড়ি জোনে নিয়ে আসে। তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় ও জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। ঘটনা এখানে শেষ হলে হয়ত এ লেখাটার জন্য শ্রম ব্যয় করতে হতো না। আর অভিনয় ও নাটক মঞ্চায়নে সেনাবাহিনীর দক্ষতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যেত না।

গ্রেফতারের কয়েকদিন পর খাগড়াছড়ি জোন অফিস তাদের দু'জনকে জলপাই রঙের পোষাক পরিয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির করে। দু'একটি জাতীয় দৈনিকে অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদের ছবি ছাপা হয়। পত্রিকায় লেখা হয় যে তাদেরকে গত ৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাতে গরগজ্যাছড়িতে সংক্ষিপ্ত গুলি বিনিময়ের পর সেনারা আটক করে। তাদের কাছ থেকে দুইটি সাবমেশিনগান সহ চারটি অস্ত্র, গোলাবারুদ, কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। তাদের দু'জনের নাম প্রতুলময় চাকমা (২০) ও বিনয় ত্রিপুরা বলে সেনারা জানায়। এমনকি তারা দু'জন গত সপ্তাহে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে ক্রসফায়ারে একজন সেনাসদস্য নিহত হওয়ার ঘটনার সাথেও জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্য একটি ঘটনায় গত ২৩ আগষ্ট সেনা সদস্যরা অনুপম চাকমা (ডাক নাম জিঙ্কু) নামে একজন ইউপিডিএফ সমর্থককে গ্রেফতার করে। তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করা হলে সে ক্যাম্পে সেনা হেফাজতে মারা যায়। সেনা সদস্যরা এই ঘটনা ধামাচাপ দেয়ার জন্যও প্রচার করে যে সে সন্ত্রাসীদের সাথে ক্রসফায়ারে মারা গেছে।

সেনাবাহিনীর এই অপকর্ম চুক্তিপূর্ব পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন মেজর ইব্রাহিমের দোর্দন্ড প্রতাপ (চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বর্তমানে ইনি হযরত মোহাম্মদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন)। ঘটনাটা হবে ১৯৮৯ কি ১৯৯০ সালের দিকে। খাগড়াছড়ির একটা হোস্টেলের কয়েকজন ছেলের হাতে সেনারা "আমরা শান্তি চাই, শান্তিবাহিনী নিপাত যাক" এ ধরনের ব্যানার ধরিয়ে দিয়ে ছবি ওঠায়। পরে এ সব ছবি সে সময় সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাটা জানতে পেরে কমিশন তাদের রিপোর্টে ঐ ছবি ছাপে, তবে ক্যাপশনে লিখে দেয় যে উই ওয়ান্ট পিস্ বাট আন্ডার ওয়াচফুল আই অব দ্যা আর্মি। অর্থাৎ আমরা শান্তি চাই, তবে সেনাবাহিনীর কড়া নজরদারিতে!!

এ ধরনের কম্ম আর্মিরা সে সময় হরহামেশা করতো। সাধারণ লোক ধরে এনে জলপাই রঙের পোষাক পরিয়ে দিয়ে শান্তিবাহিনী ধরেছে বলে প্রচার করতো। এতে সংশ্লিষ্ট সেনা কমান্ডারের প্রমোশনের ক্ষেত্রে কাজ হতো।

ইউপিডিএফ এর ঐ দুই সদস্যকে জলপাই রঙের পোষাক পরিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, চুক্তির পরও সেনাবাহিনী তাদের অভ্যাস পাল্টাতে পারেনি এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উপস্থিতি জায়েজ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনাও উল্লেখ করা দরকার। গত ৩ আগষ্ট মঙ্গলবার জনসংহতি সমিতির লোকজন প্রকাশ্য দিবালোকে ভূবনজয় চাকমাকে রাঙ্গামাটি শহরের তবলছড়ি থেকে অপহরণ করে। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেয়ে দেয়া হয়। পত্র পত্রিকায় এ ঘটনাকে যেভাবে ট্রিট করা হয়, তাতে বোঝা যায় পতনমান জনসংহতি সমিতিকে ঠেস্ দিয়ে রক্ষার জন্য কেবল সরকার-সেনাবাহিনী নয়, পত্রিকাওয়ালারাও নিযুক্ত রয়েছে।

ইউপিডিএফ এর যে দুই জন কর্মিকে সেনাবাহিনী আটক করে জলপাই রঙের পোষাক পরিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করেছে, তারা ইউপিডিএফ এর সাধারণ সদস্য। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের ভয়ে এলাকায় থাকতে না পেরে তারা অন্য এলাকায় কাজ করছিলেন। দিনে দুপুরেই তাদেরকে ক্ষেতে কাজ করার সময় ধরে নিয়ে আসা হয়। তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ, কাগজপত্র পাওয়ার অভিযোগ মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে আরও একটি বড় অসঙ্গতি হলো, তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয় ২ আগষ্ট। অথচ প্রচার করা হচ্ছে তাদেরকে ৫ আগষ্ট গোলাগুলির পর গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার দিন গরগজ্যাছড়িতে গোলাগুলি হয়েছে কিনা একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে। ২ তারিখ ধরে নিয়ে আসা হলেও এত দেরীতে সাংবাদিকদের সামনে ঐভাবে তাদের হাজির করার মানেটা কি? তাছাড়া, তাদেরকে বাঘাইছড়িতে ক্রসফায়াসে জনৈক সেনা কনস্টেবল নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে জড়িত করা হয়েছে। বাঘাইছড়ির ঐ ঘটনাটাও ঘটেছে ২ আগষ্ট। সুতরাং তারা কিভাবে ঐ ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে? এ সব প্রশ্ন সাংবাদিকরা সেনা কর্মকর্তাদের করেছেন কিনা জানা যায়নি।

বস্তুতঃ জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পনের পর সরকার ও সেনাবাহিনী এখন ইউপিডিএফ এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে অপপ্রচারণায় নেমেছে। অবশ্য আমরা এতে বিস্মিত নই। কারণ এটা খুই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে, সরকার ও সেনাবাহিনী তাদের দালালদের রক্ষা করবে ও জনগণের পক্ষের শক্তির ওপর নানাভাবে আঘাত হানবে। □

# সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ❑ বুলেটিন নং ২৯

## তাহলে কি সেনাবাহিনীর সমালোচনা করা যাবে না?

গত ৬ আগষ্ট ২০০৪ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর এলাকায় সেনা সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একটি সমাবেশে হামলা চালায়। তারা পিসিপি'র জেলা শাখার সম্মেলন শেষে আহুত সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদেরকে বেধড়ক মারপিট করতে থাকে। রাইফেলের বাটের গুঁটো মেরে ও বাজারে নিয়ে আসা লাকড়ি দিয়ে অনেককে আহত করে। আহতের মধ্যে পিসিপি'র সভাপতি মিঠুন চাকমা, সহসভাপতি রূপন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সোনালী চাকমাও রয়েছেন। সেনা সদস্যরা এতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা পিসিপি সভাপতি মিঠুন চাকমা ও সহসভাপতি রূপন চাকমাসহ মোট ৭ জনকে ধরে খাগড়াছড়ি ব্রিগেড অফিসে নিয়ে যায়। সেখানেও তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। সেনা সদস্যরা পরে মিঠুন চাকমা ও রূপন চাকমাকে মুক্তি দিলেও বাকি ৫ জনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। এই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এখন অস্ত্র আইনে মামলা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মিঠুন চাকমা ও রূপন চাকমাকে মুক্তি দেয়ার সময় সেনা সদস্যরা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক এই মর্মে লিখিত বিবৃতি নেয় যে, তাদেরকে (অর্থাৎ মিঠুন ও রূপন) সেনাবাহিনী আটক করেনি, আটক করেছে পুলিশ।

এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, কি কারণে পিসিপির গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলা করা হলো এবং কেন পিসিপি সভাপতিসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হলো? কি দোষ করেছে সমাবেশকারীরা? মুক্তি পাওয়ার পর পিসিপি নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, তাদের ওপর যখন শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন সেনা সদস্যরা আক্রোশের সাথে বলছিল সেনাবাহিনীকে সমালোচনা করলে এভাবে শিক্ষা দেয়া হবে। প্রশ্ন, তাহলে কি সেনাবাহিনীকে ও তাদের ভুলত্রুটির সমালোচনা করা যাবে না? তারা দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাবে, সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার বুটের তলায় পিষ্ট করবে, অথচ এ জন্য তাদেরকে সমালোচনা করা যাবে না? তারা কি সমালোচনার উর্ধ্বে? আন্তর্জাতিক আইনের কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের সংবিধান, আইন এসব কি পার্বত্য চট্টগ্রামে দখলদার সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্ন হলো, পুলিশ যদি সত্যিই মিঠুন-রূপনদেরকে গ্রেফতার করে থাকে, তাহলে তার জন্য জোরপূর্বক লিখিত বিবৃতি নেয়ার মানেটা কি? পুলিশ গ্রেফতার করলে তাদের খাতায় নথিভুক্ত থাকবে। আলাদা করে বিবৃতি আদায়ের দরকার কি হতে পারে? এতে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে সেনাবাহিনী এই বিবৃতি নেয়ার মাধ্যমে তাদের দুর্বলতাই প্রকাশ করেছে? যদি ভুল বা আক্রোশবশতঃ নীচু স্তরের সেনা সদস্যরা এই হামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভুল বা দোষ স্বীকার করার সৎ সাহস উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা দেখাতে পারলেন না কেন? জোরপূর্বক ঐ লিখিত বিবৃতি আদায়ের মাধ্যমেই কি সেনাবাহিনীর নৈতিক পরাজয় ঘটেনি?

তৃতীয় জরুরী প্রশ্ন হলো, কেন মিঠুন ও রূপনকে ছেড়ে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে আটক রেখে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলো? এজাহারে তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে লেখা হয়েছে যেন তাদেরকে মিঠুনদের থেকে পৃথকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া এজাহারে যা লেখা হয়েছে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সে ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই। আমরা চাই আটককৃত বাকি পাঁচজনকেও অচিরেই মুক্তি দেয়া হোক। মুক্তি দেয়া হোক বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যদেরও।

সভা সমাবেশ করা, মতামত প্রকাশ করা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু এই অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বার বার ভুলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের সভা সমাবেশে হামলা, তাদের নেতা কর্মি ও সমর্থকদের হত্যা, গ্রেফতার, শারীরিক নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আর এজন্য প্রধানত দায়ি পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু গণহত্যা সংঘটনকারী সেনাবাহিনী। তারা এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে *de facto* ruler. তাদের খবরদারি ও নজরদারি সর্বত্র। তাদের হস্ত ক্ষেপের কারণে বেসামরিক প্রশাসনও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না।

আমরা দ্রুত এসবের অবসান চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ সাধারণ জনগণের ওপর, ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর ওপর অনেক অন্যায় অবিচার ও নির্যাতন করা হয়েছে। চুক্তির নামে তাদের সাথে ছলা কলা করা হয়েছে। তাই ক্ষোভ বিক্ষোভ ও বঞ্চনার গ্লানি এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মনে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। আমরা চাই জনগণের এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও বিক্ষোভ বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই সরকার জনগণের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিক। জনগণের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক।

## ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা

২১ আগষ্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলা ও শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার যে তাকে হত্যার প্রচেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এই কাপুরুষোচিত ও ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।

সভা-সমাবেশে ও অন্যান্য গণঅনুষ্ঠানে বোমা হামলা নতুন না হলেও ২১ আগষ্টের ঘটনার ভয়াবহতা দেশের আপামর জনগণকে আতঙ্কগ্রস্ত না করে পারে না। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো বোম হামলার ঘটনা ২১ তারিখ শেষ নয়। ৫ সেপ্টেম্বর সিলেটে পুনরায় বোমা হামলা হয়েছে ও বান্দরবানসহ আরো অন্যত্র বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয়েছে। হামলাকারীরা যেই হোক তাদের যে সুগভীর রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে এবং তারা যে যথেষ্ট সুসংঘবদ্ধ তা ১৯৯৯ সালে উদিচির অনুষ্ঠানে বোমা হামলা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেসব বোমা হামলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। কাজেই এদের মোকাবিলার জন্য কেবল তদন্ত -তা যে মাত্রায় ও যার মাধ্যমেই হোক - যথেষ্ট নয়, তাদেরকে মোকাবিলার জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ।

সময়ে এক ফোঁড় অসময়ে দশ ফোঁড়। চিহ্নিত অপশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থা নেয়া না হলে যে কি পরিণাম হতে পারে বর্তমান পরিস্থিতি তাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

**সম্পাদক**

স্বাধিকার নামে আমাদের পাহাড়িদের একটি অত্যাচারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের মাধ্যম রয়েছে জেনে খুব ভাল লাগল। আপনারা প্রতিদিন কষ্ট করে এই "স্বাধিকার" নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা করে আসছেন তাই আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্পাদক সাহেব, আমি এ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হতে চাই, কিন্তু আমি থাকি রাঙ্গুনীয়ায়। এখানে পাহাড়ি খুব কম। তাই হয়ত এই সমস্ত পত্রিকা এখানে বিক্রয় করা হয় না। কিন্তু আমি এ পত্রিকা দৈনিকভাবে পেতে চাই। কিভাবে পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে জানালে খুশী হব। আর মাঝে মাঝে লেখা পাঠাতে চাই- যদি আপনারা ছাপেন। এ রকম আর কোন পত্রিকা রয়েছে কিনা জানালে উপকৃত হব।

নিবেদক, আপনার বিশ্বস্ত

**বিধু চাকমা, রাঙ্গুনীয়া**

*আপনার চিঠির উত্তর ডাকযোগে দেয়া হয়েছে। আশাকরি ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবেন।*

# পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা কারা?

॥ অক্ষয় ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত। যখন থেকে বিদ্রোহ দমনের নামে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার অধিকার দেয়া হয়, তখন থেকেই সেখানে গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়। সেনাবাহিনীই সর্বেসর্বা ও সকল ক্ষমতার প্রতিভূ হয়ে যায়। জনগণের মৌলিক মানবাধিকারকে শূলে চড়ানো হয়। সে এক দীর্ঘ কথন। বর্তমান লেখায় তার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক।

বৃটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সে সময় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পাহাড়ি জনগণ প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তফশীলী সম্প্রদায়ের আসন থেকে বি.কে রোয়াজা ও বুড্ডিষ্ট আসন থেকে কামিনী মোহন দেওয়ান মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লি বা এম.এল.এ নির্বাচিত হন। পাকিস্তান শাসনামলে সারা দেশে গণতন্ত্র ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ সময় ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠলেও এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও, একটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তখনো সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই কেবল জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশেষত আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু অচিরেই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হলে গণতান্ত্রিক পন্থায় দাবি আদায়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে শাসক গোষ্ঠির মৌলিক নীতি ঠিক করে দেন। সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে তার সরকার উৎখাতের পর দেশের সামরিক কিংবা বেসামরিক সকল সরকারসমূহ তার সেই নীতির ধারাবাহিকতাই কেবল বজায় রেখে চলেছেন। শেখ সাহেবই প্রথম ঘোষণা দেন যে, পাহাড়ি জনগণকে নির্মূলের জন্য প্রয়োজনে তিনি সেখানে লাখ লাখ বাঙালি পুনর্বাসন করবেন। কাজেই বাঙালী পুনর্বাসন জিয়া সরকারের আমলে হলেও, এটা নিঃসন্দেহ যে শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে তিনিও একই কাজ করতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে জনগণের দাবি পূরণ না হলেও অন্ততঃ কিছুটা হলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারতো। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতি মিলিতভাবে সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের আত্মসমর্পণের পরপরই এরা গণতান্ত্রিক নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করে চুক্তির সমালোচনাকারী পাহাড়ি (চুক্তি বিরোধীতাকারী বাঙালীদের নয়) সংগঠনগুলোর ওপর চড়াও হয়। পাহাড়ি গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভা সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। বহু নেতা কর্মিকে বিনা বিচারে আটক করা হয়, শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকরা সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মহাউৎসাহের সাথে তিন সংগঠনের নেতা কর্মিদের ধরিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা তার কর্মিদেরকে ইউপিডিএফ এর কর্মি সমর্থকদের গলা টিপে হত্যা, চোখ তুলে নেয়া ও হাত পা ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, তাদের দলের সর্বোচ্চ সংস্থা জাতীয় কংগ্রেসেও ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত পাশ করা হয়।

অপরদিকে নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রে পুলিশকেও লাইসেন্স দেয়া হয়। খোদ চট্টগ্রামে পুলিশ ইউপিডিএফ এর আহুত সমাবেশ বানচাল করে দেয়, ৪৫ জনকে আটক করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। খাগড়াছড়িতে সমাবেশে যোগ দিতে আসা তিন সংগঠনের সমর্থকদের পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে। সরকার ও জনসংহতি সমিতি চুক্তির সামান্যতম সমালোচনাও সহ্য করতে অনীহা প্রকাশ করে। পরে জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফ কে দমনের জন্য নিজেই একটি সশস্ত্র ঠ্যাঙারে বাহিনী গঠন করে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমোরে সরকারপন্থী জঙ্গী মিলিশিয়াদের মতো কিংবা সম্প্রতি সুদানের দারফুরে সরকারী মদদপুষ্ট জিংগাউইড মিলিশিয়াদের মতো জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপগুলোও সরকার ও সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ নিয়ে একই ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রেকর্ডও ভালো নয়। এ সরকার দিনরাত বিরামহীনভাবে নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে থাকে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তাদেরকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম সম্মান প্রদর্শন করতে দেখা যায় না। অতি সম্প্রতি গত ৬ আগষ্ট খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সমাবেশে হামলা চালায়, বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক আঘাত করে ও সংগঠনের সভাপতি মিঠুন চাকমা, সহসভাপতি রূপন চাকমাসহ ৭ জনকে ধরে নিয়ে যায়। অতর্কিতে চালানো সেনাবাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সোনালী চাকমাও বাদ যাননি। সমাবেশে উপস্থিত সাধারণ লোকজনকে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসা লাকড়ি দিয়ে মারধর করা হয়। কোন কারণ ছাড়াই আকাশ থেকে বজ্রাঘাতের মতো সৈন্যরা এ ঘটনা ঘটায়।

এ ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন না হলেও যেভাবে সেনাবাহিনী এখন গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করার মতো। কিছুদিন আগে তারা নান্যাচরে ইউপিডিএফ এর অফিস উদ্বোধনে মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। অবশ্য সে চেষ্টা তাদের সফল হয়নি, যদিও ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সত্যি বলতে কি, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কিভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব ও হরণ করছে সে সম্পর্কে লিখতে গেলে একটা প্রকান্ড বইয়েও কুলোবে না। তাদের দাপটে সাধারণ বেসামরিক প্রশাসনও জিম্মি। তাদের হুকুমদারিতেই বেসামরিক প্রশাসনকে চলতে হয়। সাধারণ অষ্টম শ্রেণী পাশ করা সিপাহীদের ভয়েও লোকজনকে ত্রটস্থ থাকতে হয়। সরকারের পোষ্যপুত্র হলেও সন্তু লারমা একটা সত্য কথা বলেছেন। মনের দুঃখে তিনি একবার বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন সিপাহীর যে ক্ষমতা, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েও তার সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু সব দালালের চরিত্র এক। ক্ষমতা না থাকলেও তারা পদ ছাড়েন না, যদি না জোর করে গলায় ধরে তাদেরকে নামানো না হয়।

এই লেখাটার যদি উপসংহার টানতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সেনাবাহিনী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সরকারের স্ট্যাটাস ক্যু বজায় রাখার নীতি। তবে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপগুলোও কম বাধা নয়। সরকারী নীতির পাশাপাশি জেএসএস সভাপতি সন্তু লারমার চরম অগণতান্ত্রিক মানসিকতা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। তারাও জনগণের মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্য কম করেনি। সামান্যতম সমালোচনাকেও তারা পেশী শক্তি দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে ও এখনো চাইছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যখন পরিস্থিতি তখন জনগণের যা করণীয় তা হলো প্রকৃত শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য অবিরাম সংগ্রাম জারি রাখা। লড়াই করেই অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। বাংলাদেশের জনগণ লড়াই করে এরশাদশাহীর পতন ঘটিয়েছে। ইতিহাসে পৃথিবীর বহু দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসককে জনগণের ঐক্যবদ্ধ উত্থানের মুখে নির্মমভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। জনগণই আসল শক্তির উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যেদিন জেগে উঠেছেন সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পিছু হটতে হয়েছিল। তাদের দালালরাও খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। সেদিন আর বেশি দেরী নয় যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আবার প্রবল তেজে জেগে উঠবেন। আর তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাসের ঘরের মতো ছত্রখান হয়ে যাবে। জনগণের বিজয় কোনদিন রোধ করা যায়নি। ভবিষ্যতেও যাবে না। প্রতিক্রিয়াশীলরা হুঁশিয়ার! সরকারের দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান!! ❑

## সরেজমিন

# ধ্বংসযজ্ঞের একবছর পর মহালছড়িবাসীরা কেমন আছেন?

## একটি সরেজমিন প্রতিবেদন

- যুধিষ্ঠির

*পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হওয়ায় এবং অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় মহালছড়ির লোকজন এখনও ভীত সন্ত্রস্থ। নিরাপত্তাহীনতা সর্বত্র এবং সবার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।*

মহালছড়ি ধ্বংসযজ্ঞের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলো। গত বছর ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এলাকার পাহাড়ি গ্রামগুলোতে বর্বরোচিত হামলা ও লুটতরাজ চালায়। এই হামলায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৯টি গ্রামের ৪ শতাধিক বাড়িঘর। নৃশংসভাবে খুন করা হয় প্রবীন নেতা বিনোদ বিহারী খীসা ও নয় মাস বয়সী শিশুপুত্র কিরিতনকে। আহত হন পনের জনের অধিক। এছাড়া ধর্ষণের শিকার হন কালাসোনা চাকমাসহ বেশ কয়েকজন জুম্ম নারী। সেনা সদস্য কর্তৃক লাঞ্ছিত হন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তছ্‌নছ্‌ করা হয় ৪টি বৌদ্ধ বিহার। ১৯৯৭ সালের চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।

এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। ইউপিডিএফ ৮ সেপ্টেম্বর ঘটনাস্থল মহালছড়িতে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিলে হাজার হাজার নারী পুরুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু জনগণের দাবি সত্ত্বেও সরকার ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হয়। বরং ঘটনা সংঘটনকারীদের রক্ষার জন্য সরকার সব রকম ব্যবস্থা করে।

একবছর পর মহালছড়ি ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কেমন আছে তা জানার জন্য স্বাধিকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা ২২ ও ২৩ আগষ্ট মহালছড়ির কয়েকটি গ্রামে সফর করি ও লোকজনের সাথে কথা বলি।

২২ আগষ্ট যখন আমরা সেখানে পৌঁছি তখন চব্বিশ মাইল ও থলিপাড়াসহ আশে পাশের এলাকায় ব্যাপক সেনা টহল চোখে পড়ে। একজন পাহাড়ি এসে আমাদের বললেন তাড়াতাড়ি চলে যেতে। কারণ নতুন বা অপরিচিত কাউকে দেখলে সেনাবাহিনী সন্দেহমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে এবং একটু গড়মিল হলেই মিথ্যা মামলা সাজিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেয়। আর ইউপিডিএফ এর নেতা কর্মি হলেতো কথাই নেই - সোজা ক্যাম্পে ও পরে থানায় চালান করে দেয়। এ অবস্থা জানার পর আমরা খুব তড়িঘড়ি করে ও সতর্কভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঢুকে পড়লাম। কেরেঙ্গানালা, দুরপুজ্যানাল, পাহাড়তলী, রামেসু পাড়া ঘুরে স্থানীয় মুরুব্বী এবং লোকজনের সাথে কথা বলি। এর পর সমিল পাড়া ও বাবুপাড়ার দিকে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে গ্রামবাসীরা যাওয়া ঠিক হবে না বলে আমাদের সতর্ক করে দেন। অগত্যা আমরা তাদের পরামর্শ মোতাবেক লেমুছড়ি যাই। আমাদেরকে এভাবে যুদ্ধাঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের মতো কাজ করতে হলেও, একটা বিষয় খুব চোখে পড়ার মতো। সেটা হলো প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের প্রবেশ পথে শোভা পাচ্ছে দু'টি বড় সাইন বোর্ড। এর একটি ইউএনডিপি'র - যাতে স্পষ্টভাবে বাংলায় লেখা "ইউরোপীয় জনগণ 'একো' এর মাধ্যমে .... পাড়া'র জনগণের প্রতি তাদের জীবন পুনর্গঠনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।" আর অপর সাইনবোর্ডটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। তাতে লেখা "Humanitarian Assistance for ... by Bangladesh Army".

১. রেশন ব্যবস্থা: ঘটনার পর বিভিন্ন এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সংগঠন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ সহ অন্যান্য মানবিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। তারপর সরকারী প্রশাসন এবং রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত জনপ্রতি মাসিক ১৩ কেজি করে চাউলের রেশন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম একই হারে রেশন প্রদান করে। এই সময়ে চাল ছাড়াও ডাল, তেল, বিস্কুট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও রেশনিংএ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে জুলাই মাস থেকে রেশন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা ইউএনডিপি, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে আরো কিছু সময় পর্যন্ত রেশন প্রদান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন। তবে এখনো পর্যন্ত তারা কোন সংস্থার কাছ থেকে আশ্বাস পাননি, জানালেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী।

২. আবাসন: ঘটনা পরবর্তী সময়ে সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার কাজ হাতে নেয়। দেশের সকল মহলের ব্যাপক প্রতিবাদ ও চাপের মুখে সরকার ও সেনাবাহিনী মুখ রক্ষার্থে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া সরকারের আশঙ্কা ছিল এমনিতে চুক্তির মাধ্যমে কোন কিছু না পাওয়ার বঞ্চনা ও ক্ষোভ-অসন্তোষ রয়েছে জনগণের মনে। তার ওপর যদি মহালছড়ি হামলার মতো ঘটনা যোগ হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ফুঁসে উঠবেন। তখন তারা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে দিতে পারে। বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে সরকারের এই ভয়ও কাজ করেছিল বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। আর এটা অবশ্যই সত্যি যে, অনেক নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি সে সময় আশা করেছিলেন যে ইউপিডিএফ ও জেএসএস জোট বেঁধে আন্দোলনের মাঠে নামতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জেএসএস নেতৃবৃন্দ তাদের হতাশ করেছিলেন। জনগণের সেই চরম দুর্যোগের সময়ও জেএসএস ঐক্য ও সমঝোতায় এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়। বরং তারা সে সময় ঘটনার জন্য ইউপিডিএফ -কেই দায়ি করে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করতে থাকে, যা প্রকারান্তরে সরকার ও সেনাবাহিনীকেই লাভবান করে। অপরদিকে, ইউপিডিএফ ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সব সময় জনগণের পাশে থাকে।

যাই হোক, যেহেতু সেনাবাহিনীই প্রত্যক্ষভাবে হামলার সাথে জড়িত, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে জনগণে অসন্তোষ ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়। ফলে সঙ্গত কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা সেনাবাহিনীর মতলবী প্রস্তাব পুরোপুরি উপেক্ষা এমনকি প্রত্যাখ্যান করে। উপায়ান্ত র না দেখে সেনা সদস্যরা বাঙালী শ্রমিকদের দিয়ে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ১২/২০ ফুট মাপের নামমাত্র বাড়ি নির্মাণ করে দেয়। টিন শেড ও বাঁশের বেড়ার এ বাড়িগুলো অনেকাংশে অসম্পূর্ণ বলে গ্রামবাসীরা জানান। এ প্রতিবেদকও সেনা সদস্যদের নির্মিত বেশ কয়েকটি বাড়ি অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখতে পায়। ইউএনডিপি মহালছড়ি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সহযোগিতা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। ইউএনডিপি সেখানে কি ধরণের ও কি পরিমাণ সহযোগিতা দরকার তা নির্ধারণ করে। এরপর তারা কারিতাসের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণের কাজে হাত দেয়। ১০/২০ ফুট মাপের অর্ধ পাকা টিন শেড বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রতি গ্রামে কারিতাস সুপারভাইজার নিয়োগ করে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ করার তাগিদ রয়েছে বলে জানালেন কেরেঙ্গানালার সুপারভাইজার মামা প্রু মারমা। বাড়িগুলো নির্মাণে গ্রামের অনেকেই দৈনিক একশত টাকা মজুরী হিসেবে কিংবা চুক্তিভিত্তিক কাজ করছেন বলে জানালেন কেরেঙ্গানালার মুরুব্বী জ্যোতির্ময় দেওয়ান ও রীতা খীসা। প্রত্যেক গ্রামেই দেখা গেল বাড়ির জন্য রড সিমেন্ট দিয়ে তৈরি খুঁটি জায়গায় জায়গায় রাখা হয়েছে। অনেক বাড়ির নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়া, পাহাড়তলিস্থ মহালছড়ি সদর ইউপি চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িসহ যাদের পাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বাড়ি পুনঃনির্মাণের জন্য নগদ নব্বই হাজার টাকা দেয়া হবে। এ তথ্য জানালেন আর্কিমিডিস চাকমার বাবা। প্রথম পর্যায়ে ইউএনডিপির পক্ষ থেকে জরুরীভাবে পুড়ে যাওয়া বাড়ির চাইতে আকারে ছোট করে ৩৩ পরিবারের জন্য আধা পাকা টিনশেড বাড়ি বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। যদিও অধিকাংশ পরিবারের জন্য বাড়িগুলো ছোট, তারপরও বাড়ি নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হলে অন্তত থাকার সমস্যা অনেকটা লাঘব হবে বলে এলাকাবাসীরা জানালেন।

৩. বিবিধ সহায়তা: ঘটনার পর এ পর্যন্ত বহু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা রেশন ছাড়াও অন্যান্য মানবিক সাহায্য প্রদানে এগিয়ে এসেছিল বলে জানালেন এলাকাবাসীরা। চাষীরা যাতে ঠিকমতো কাজ করতে পারে সেজন্য ইউএনডিপি'র পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক গ্রামের জন্য পাওয়ার টিলার ও পাম্প মেশিন দেয়া হয়েছে। তাছাড়া যাদের মেশিন পুড়ে গেছে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব পরিবারকে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। কেরেঙ্গানালার রীতা খীসা তাদের পুড়ে যাওয়া দুটো মেশিন ইউএনডিপি কর্তৃক পূরণ করে দেয়া হয়েছে বলে জানালেন। ইউএনডিপি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির তালিকার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেল। পর্যাপ্ত না হলেও যে সময়ে যে ধরনের সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দরকার ছিল তা পাওয়া গেছে বলে ক্ষতিগ্রস্তরা মন্তব্য করেছেন। তবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেছেন সবাই।

৪. মামলা: ঘটনার আগে ও পরে পাহাড়ি এবং বাঙালি উভয় পক্ষ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়। এ ধরনের একটি মামলায় আর্কিমিডিস চাকমাসহ ১৫ জনকে আসামী করা হয়েছে। সেনাসদস্যরা বিজয়কৃষ্ণ মহাজনকে উস্কানি দিয়ে এই মামলা করিয়েছে। বর্তমানে এই মামলায় ইউপি সদস্য বিপুল চাকমা ও উলামং মারমা আটক রয়েছেন। (মামলা নং জিআর ১৮২/০৩।)

মহালছড়ি পুলিশের পক্ষ থেকেও একটি মামলা করা হয় দন্ডবিধির ১৪৩/৩০২/৩২৬ ধারায়। এই মামলায় আসামী করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ৪/৫ হাজার। ৪৩ জনকে এই মামলার আসামি দেখিয়ে গ্রেফতার করা হয়। তবে বর্তমানে তাদের সবাই জামিনে রয়েছে। (মামলা নং জিআর ১৮৩/০৩)।

আবুল কাশেম নামে অন্য একজন ৩২৬/৩০৭ ধারায় অন্য একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলার আসামী হলেন ডু অংগ্য মারামসহ ২০ জন। (মামলা নং জিআর ১৮৪/০৩)।

এছাড়া, জহিরুল ইসলামসহ ৩০ জনকে আসামী করে মহালছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য একটি মামলা দায়ের করেন দন্ডবিধির ৩৩৫/৩৩৬/৩৭৯/৩২৩ ধারায়। (মামলা নং জিআর ১৮৫/০৩)।

ধর্ষণের শিকার কালাসোনা চাকমা নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং জিআর ২০১/০৩। মামলাটি তদন্ত শেষে F.R.T দেয়া আছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ট্রাইবুনালে পাঠানো হলেও মামলাটির কোন অগ্রগতি হচ্ছে না।

ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এসব মামলার কোন অগ্রগতি নেই। আসামী সন্ত্রাসী কাদেরসহ ঘটনার মূল নায়করা প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। অপরদিকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে তারা জানালেন। তারা আরো জানালেন, গ্রেফতার ও হয়রানির ভয়ে অনেকে বর্তমানে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

পাহাড়িদের পক্ষ থেকে অন্য একটি মামলা দায়ের করেন সমীরণ চাকমা। এই মামলার নম্বর হলো জিআর ২০২/০৩। মামলাটির F.R.T দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

৫. এলাকায় সেনা তৎপরতা: মহালছড়িতে সাধারণ প্রশাসন বলতে কিছু নেই, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেনাবাহিনী - বললেন রামেসু পাড়া, পাহাড়তলি ও বাবুপাড়ার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু মুরুব্বী। আমাদের সেখানে অবস্থান কালে ২৩ আগষ্ট সকাল ৯টায় সেনা জোনে সবাইকে ডাকা হয়েছে বলে জানালেন তারা। তাদের কয়েকজন অনেকটা প্রতিবাদের সুরে বললেন, "আমরা অর্থাৎ মহালছড়ির জনগণ আজ সেনবাহিনীর কাছে জিম্মি। ঘটনার পরও সেনা হয়রানি কমেনি বরং মাস খানেক আগে থেকে তাদের তৎপরতা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে।" মুরুব্বীরা আরো জানালেন, উলা অং মারমাকে (২০) মহালছড়ি বাজারে গ্রেফতার করে তার কোমড়ে অস্ত্র গুজিয়ে দিয়ে থানায় সোপর্দ করেছে সেনা সদস্যরা। ঐ দিন রাতে হামলার সময় নিহত বিনোদ বিহারী খীসার ছেলে নিদর্শন খীসাকে বাবুপাড়ার বাড়িতে খুঁজেছিল মহালছড়ি জোনের সুবেদার মেজর। তারা আরো বললেন, পাহাড়িরা এখনো ভীত সন্ত্রস্থ এবং তারা মহালছড়ি বাজারে যেতে ভয় পায়। অথচ বাজার ছাড়াও চলা যায় না। তাই বিকল্প হিসেবে সিঙ্গিনালায় এবং মাইসছড়ি বাজারে যেতে হয়। কিন্তু সিঙ্গিনালা বাজারও সেনাবাহিনী বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা মহালছড়ি বাজারে যেতে লোকজনকে বাধ্য করছে। কিন্তু এতবড় ঘটনার পর হামলাকারীরা যেখানে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রতিবাদে অনেকেই মহালছড়ি বাজারে যেতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া মহালছড়ি বাজারে গেলে রয়েছে গ্রেফতারের ভয়। কারণ বাঙালীরা ৪/৫ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। যে কাউকে ধরে ঐ মামলায় আসামী করতে পারে। সেজন্য মহালছড়ি বাজার এখন প্রায় ফাঁকা থাকে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সবসময় মুরুব্বী ও জনগণের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা হয়েছে যেন তারা মহালছড়ি বাজারে যায়। মুরুব্বীদের সাথে আলোচনায় আরো জানা যায়, রামেসু পাড়ার থৈংগ্যর ছেলে ইউএনডিপিসহ বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে সত্য ঘটনা বলায় বিদেশীরা চলে যাবার পর মহালছড়ি জোনের টু-আই-সি মেজর শামীম থাকে ধরে অমানবিক নির্যাতন চালায়। ঐ ঘটনার পর সে এখন বাজারে কেন এলাকায় আসতেও ভয় পায়। এখন অবশ্য মেজর শামীম আর নেই। প্রমোশন সহকারে অন্যত্র বদলী হয়েছে বলে জানা গেছে। মেজর শামীম এলাকায় ত্রাস ছিল বলে সবাই জানান।

তবে সে না থাকলেও সেনা হয়রানি মোটেই কমেনি। গ্রামে গ্রামে তল্লাশীর নামে লোকজনকে হয়রানি জিজ্ঞাসাবাদ হুমকি মারধর এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্বাধিকারের এই প্রতিনিধিও সেখানে দুই দিন অবস্থানকালে তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে। আমরা যেদিন মহালছড়ি যাই সেদিনও দুপুর ও রাতে গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। পরে জানা গেল চব্বিশ মাইল, যৌথ খামারসহ আশেপাশের এলাকায় সেনা সদস্যরা লোকজনকে ভীতিমূলক অবস্থায় রাখার জন্য এভাবে ফায়ার করছিল।

৬. ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তাহীনতা ও দাবি: পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হওয়ায় এবং অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় মহালছড়ির লোকজন এখনও ভীত সন্ত্রস্থ। নিরাপত্তাহীনতা সর্বত্র এবং সবার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এ কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছেন। ঘটনার পর এলাকাবাসীর দাবি ছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা, মহালছড়ি জোন কমান্ডার আব্দুল আওয়ালসহ মহালছড়ি হামলার সাথে জড়িত সকল সেনা সদস্য ও সেটলারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন ও তাদের বিরুদ্ধে দেয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা। এ সব দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার এসব দাবির কোনটায় পূরণ করেনি। জনগণের মনে আস্থা সৃষ্টিকারী কোন পদক্ষেপই সরকারের দিক থেকে এ যাবত গ্রহণ করা হয়নি। অপরাধীরা যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খাগড়াছড়ির এমপি ওয়াদুদ ভুইয়া প্রশাসনের সহযোগীতায় যেভাবে এলাকায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পুনর্বাসন করে চলেছে তাতে মহালছড়িবাসীরা খুবই উদ্বিগ্ন।

মন্তব্য: ঘটনার এক বছর পর এখনও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি গ্রামের পাহাড়ি জনগণ। বর্তমানে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছেন। পরিবেশ পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হয়নি গত এক বছরে। ইউএনডিপি, ডব্লিউ.এফ.পিসহ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাষ্ট্র তাদের মানবিক সাহায্যে ও পুনর্বাসনে এগিয়ে আসলেও, ক্ষতিগ্রস্তদের জানমালের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো অনিশ্চয়তায় ভরা। কারণ এ নিশ্চয়তা কেবল সরকারই দিতে পারে। কিন্তু সরকার কি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের যাতে আর ঐ ধরনের হামলার মুখোমুখি হতে না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী? এ এক আজ বড় প্রশ্ন? □

# সংবাদ পত্রের কলাম থেকে

## মিঠুন চাকমাকে গ্রেফতার করা হলো কেন?

বদরুদ্দীন উমর

*মিঠুন চাকমাকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তার কারণ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সম্মেলনের কোন বক্তব্য বা ঘটনা নয়। এর কারণ হলো, জনগণের যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের ফ্যাসিস্টসুলভ তৎপরতা।*

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে একের পর এক বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই যে আচরণ করে আসছে, তাদের ওপর যে শোষণ নির্যাতন করছে, তাতে ওই সমগ্র অঞ্চলকে একটি অধিকৃত অঞ্চল মনে করা স্বাভাবিক, বিশেষত তাদের পক্ষে যারা এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। একথা বলার কারণ এই যে, আশির দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা কোনও মতে প্রতিষ্ঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সে রকম কিছু ঘটেনি। এমনকি সেখানে শান্তিচুক্তি নামে একটি চুক্তি সম্পাদনের পরও।

শান্তি চুক্তির পর নামমাত্র একটি স্থানীয় প্রশাসন খাড়া করে রাখা সত্ত্বেও সেখানে আওয়ামী আমলে যেমন, বিএনপি জোট আমলেও তেমনি, একটি সামরিক শাসনই জারি রাখা হয়েছে। যে অসংখ্য সামরিক ক্যাম্প সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ছিল সেগুলো চুক্তি স্বাক্ষরের পরও রয়ে গেছে। এবং আশির দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের চলাফেরা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে যে বাধা-বিঘ্ন ছিল তার থেকেও অনেক বেশি বাধা-বিঘ্ন এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আছে। সেখানে সাধারণ মানুষেরও নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। শুরুতেই এত কথা বলার প্রয়োজন হলো মাত্র কয়েকদিন আগে ৬ আগষ্ট ২০০৪ তারিখে খাগড়াছড়িতে সংঘটিত একটি ঘটনার কারণে।

ওইদিন খাগড়াছড়িতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) -এর জেলা কমিটির সম্মেলন ছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেলা সদরের স্বনির্ভর এলাকায়। সকাল থেকে শুরু হয়ে পিসিপি'র এই জেলা সম্মেলন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সম্মেলন স্থল থেকে একটি মিছিল বের হয়ে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি সমাবেশ হয় যাতে পিসিপি'র থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা এবং সেই সঙ্গে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রীরাও বক্তৃতা করেন। আলোচনার শেষে পিসিপি'র সভাপতি মিঠুন চাকমা বক্তৃতা শুরু করার অল্পক্ষণ পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা হঠাৎ সমাবেশের চারদিকে ঘেরাও দেয় এবং বেপরোয়াভাবে সকলকে মারপিট করতে থাকে।

তারা বাজারে বিক্রির জন্য আনা জ্বালানি কাঠ থেকে শুরু করে রাইফেলের বাট ইত্যাদি দিয়ে মারপিট করে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী মৌসুমী চাকমাসহ (আসলে হবে সোনালী চাকমা - সম্পাদক) কয়েকজনকে লাঞ্ছিত করে। এছাড়া পিসিপি'র নেতা কর্মি এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের ওপরও একইভাবে হামলা করে। এই হামলা তারা পিসিপি'র সভাপতি মিঠুন চাকমার ওপরও চালায় এবং তাকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করে। এছাড়া সংগঠনের সহসভাপতি রূপন চাকমা, ভূবন মনি চাকমা, রবি জয় চাকমাসহ আরও ছয়জনকে তাদের হাতে গ্রেফতার হন।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা পার্থক্য এই যে, এই অঞ্চলে পুলিশ নেই। পুরো অঞ্চল সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে সেখানে এক প্রকার স্থায়ী সামরিক শাসন জারি আছে। কাজেই পুলিশের পরিবর্তে সামরিক বাহিনীই সেখানে সকল কর্তৃত্বের অধিকারী এবং তারাই সার্বিকভাবে সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে।

৬ আগষ্ট তারিখে পিসিপি'র সম্মেলনের সময় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যে তাণ্ডব লীলাখেলা দেখিয়েছে সেটা তাদের এই কর্তৃত্বেরই এক নিদর্শন।

এটা কোনও বিশেষ ব্যাপার নয়। এই ধরনের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান জেলায়, এক নিয়মিত ব্যাপার। সরকারি নীতির ছত্রছায়াতেই তারা এ কাজ করে থাকে।

শান্তিচুক্তির পর বেশ কয়েক বছর চলে গেছে। এই চুক্তির ফলে সেখানকার পাহাড়ি জনগণের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ভূমি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে পাহাড়ি জনগণ নিজেদের জমি থেকে এখনও সরাসরি বলপ্রয়োগ অথবা নানা ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে উচ্ছেদ হচ্ছেন। তাদের জীবিকার নতুন কোন সংস্থানও হচ্ছে না। তাদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তাহীনতার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর সত্ত্বেও পরিস্থিতির আসল চেহারা কী সেটা ৬ আগষ্ট পিসিপি'র সম্মেলনের সময় মিঠুন চাকমার গ্রেফতার ও সমাবেশের ওপর হামলা থেকেই বোঝা যায়। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণই নয়, সারা বাংলাদেশের জনগণই সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে পারেন: মিঠুন চাকমাকে এভাবে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে? কেন তাদের শান্তিপূর্ণ সম্মেলন ও সমাবেশের ওপর অকারণে হামলা করা হয়েছে? কেন তাদের সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে না? বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর দমন নির্যাতন এক সাধারণ ব্যাপার। দীর্ঘকাল ধরে এটা চলে আসছে।

শুধু বাংলাদেশে নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এক অবস্থা। ঠিক এই মুহূর্তে ভারতের পূর্বাঞ্চল মনিপুরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ওপর ফ্যাসিস্ট হামলা দিনের পর দিন চলছে যার ছবি ভারতীয় টেলিভিশনেও দেখা যাচ্ছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য ও সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এবং পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ইত্যাদি এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। এই আন্দোলন তারা করছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যেই। এটাই অন্যতম প্রধান কারণ যার জন্য তাদের ওপর নির্যাতন এখন বাংলাদেশ সরকার ও তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনের দ্বারা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

যে সন্তু লারমা আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে তথাকথিত শান্তিচুক্তি করে স্ফীতবক্ষ হয়েছিলেন তিনি অল্প দিনের মধ্যেই চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে শুধু এখনই নয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত প্রতিদিনই অরণ্যে রোদন করছেন।

কিন্তু আন্দোলন ও রোদন এক জিনিস নয়। সন্তু লারমা রোদন করতে করতেই প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসিয়ে চলেছেন। কাজেই কোন সরকারই তার সমালোচনা এবং অভিযোগে কর্ণপাত করছে না। রোদনের দৌড় আর কতই হবে?

শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, সারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা, যাদেরকে এই সমাজে আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা হয়, তাদের ওপর শোষণ-নির্যাতন চলছে। তাদেরকে নানা ধরনের দস্যুরা, বিশেষত ভূমি দস্যুরা, তাদের ভিটেমাটি জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করছে। তাদের জীবিকা বিপর্যস্ত করছে। তাদের ওপর খুন-খারাবী পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার থেকে এর বিরুদ্ধে কোনও করণীয় নেই, এসবের কোন প্রতিকার নেই।

এই শোষণ, নির্যাতন, হামলা, উচ্ছেদ, হত্যা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আজ যে অপরাধমূলক কর্মকান্ড চলছে এই সবই হলো তার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আগের যে কোন সময়ের থেকে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার ওপর এখনকার ব্যাপক ও নির্মম নির্যাতনের মূল কারণ এটাই।

এ কারণে এসব প্রতিরোধের ক্ষোভেও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। খুবই সত্য অর্থে সংখ্যালঘুর ওপর এই নির্যাতন ও হামলা সংখ্যাগুরুর ওপর ফ্যাসিস্ট চরিত্র সম্পন্ন একের পর এক সরকারের ও তাদের ছত্রছায়ায় ক্রিমিনালদের নানা প্রকার শোষণ নির্যাতন হামলার সাথেই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ সব ধরনের সংখ্যালঘুর ওপর শোষণ নির্যাতন হামলার বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই সামগ্রিকভাবে এ দেশের জনগণের মুক্তির পথ।

৬ আগষ্ট খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা সম্মেলনে সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের এই দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। মিঠুন চাকমাকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তার কারণ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি সম্মেলনের কোন বক্তব্য বা ঘটনা নয়। এর কারণ হলো, জনগণের যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের ফ্যাসিস্টসুলভ তৎপরতা। ঢাকার রাস্তায় এবং অন্যত্র তারা পুলিশ অথবা র‍্যাবকে দিয়ে যে কাজ করাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সে কাজই করাচ্ছে সামরিক বাহিনীকে দিয়ে। এসবই এক ঐক্যসূত্রে গাঁথা।

সব ধরনের আক্রমণ যেখানে এভাবে ঐক্যসূত্রে গাঁথা সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকেও যে ঐক্যসূত্রে গেঁথে অগ্রসর হতে হবে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

১১.০৮.০৪

(সৌজন্যে আজকের কাগজ, ১৬ আগষ্ট ২০০৪)

---

## জাপানে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক কর্তৃক বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত

টোকিও প্রতিনিধি॥ গত ৯ আগষ্ট জাপানের রাজধানী টোকিওতে প্রবাসী জুম্মরা বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করে। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক -জাপান ও এম.টি.কে নামক একটি সংগঠন যৌথভাবে দিবসটি পালন করে।

সকাল থেকে দুই পর্বে অনুষ্ঠন চলে। প্রথম পর্বে জুম্ম রান্না তৈরি করে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিকট পরিবেশন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জে.পি.এন-জে এর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, চুক্তি পূর্ববর্তী ও বর্তমান সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন নির্যাতনের চিত্র তারা তুলে ধরেন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকাকালে তাদের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারা জনসংহতি সমিতির গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে তুলে ধরে বলেন, জেএসএস এখন পুরোপুরি সরকারের সহযোগি একটি দল। আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি অর্থাৎ সরকারের সমর্থন নিয়েই জেএসএস তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ইউপিডিএফ এর ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান সত্ত্বেও জেএসএস ইউপিডিএফ এর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এতে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

জুম্মদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা পোষাক প্রদর্শন করা হয়।

বিনোদনের উদ্দেশ্যে নাকামুরা নামে এক জাপানী মেয়ে চাকমা নৃত্য পরিবেশন করেন।

## জাপানে জুম্ম নেট এর উদ্যোগে স্টাডি ট্যুর প্রোগ্রাম

টোকিও প্রতিনিধি॥ জুম্ম নেট এর উদ্যোগে ৬ থেকে ৮ আগষ্ট টোকিওর ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেমিনার হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্টাডি ট্যুর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্কের কর্মকর্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়। জুম্মদের আন্দোলন জোরদার করতে হলে ইউপিডিএফ-জেএসএস এর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করা হয়।

জেপিএনজে এর কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে বর্তমান বিএনপি সরকারের কোন সদিচ্ছা নেই, বরং নতুন করে সেটলারদের ঢুকিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে নিজ মাতৃভূমিতে সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আলোচনায় অংশ নেন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের কর্মকর্তাবৃন্দ।

## সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কতিপয় চিত্র

**লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি কর্মিদের ওপর নির্যাতন**

১৪ আগষ্ট সেনাবাহিনী লক্ষ্মীছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজন বিকাশ চাকমা ও সদস্য জ্যোতির্ময় চাকমাকে সেনা ক্যাম্পে কোন কারণ ছাড়াই ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হয়।

**মাটিরাঙ্গায় সেনা হেফাজতে অনুপম চাকমা ওরফে জিষ্ণু খুন**

২৩ আগষ্ট সেনা সদস্যরা মাটিরাঙ্গা বাজার থেকে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানো হলে জিষ্ণু মারা যায়।

## বিবিধ □ বিবিধ □ বিবিধ □ বিবিধ

জানা যায় ঐদিন জিষ্ণু ঢাকায় আসার জন্য সকালে বাস অপেক্ষা করছিল। সে ঢাকার গাজীপুরে মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত কলেজের ছাত্র। এ বছর এসএসসি পাশ করেই সে ঐ কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তাকে গ্রেফতারের কারণ তার ব্যাগে তল্লাশী চালিয়ে সেনাদের কমবাট ড্রেসের মতো ডেরাকাটা রঙের একটা শর্টস পেয়েছিল। সেনারা তাকে মাটিরাঙ্গা বাজার থেকে মারতে মারতে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পেও তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়, নাকে মুখে পানি ঢেলে দেয়া হয়। এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে ক্যাম্পেই মারা যায়।

ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেনারা প্রচার করে যে, সে সন্ত্রাসীদের সাথে সেনাবাহিনীর ক্রসফায়ারে মারা যায়। তাদের দেয়া এই অপভাষ্য এনটিভিতেও প্রচার করে দেয়া হয়। পত্র পত্রিকাগুলো সেনাবাহিনীর এই মিথ্যা বিবৃতি হুবহু ছাপে।

**খাগড়াছড়িতে পিসিপি সদস্য গ্রেফতার**

সেনাবাহিনী গত ২৮ আগষ্ট বিকেলে খাগড়াছড়ি জেলার মাস্যাছড়া বাজার থেকে ফেরার পথে পিসিপি জেলা শাখার সদস্য অভিলাষ চাকমা অমূল্যকে ধরে নিয়ে যায়। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে তাকে এখনো সেনা হেফাজতে রাখা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সেনারা তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতে পারে।

॥ পিসিপি ঢাকা শাখার ৩০ আগষ্ট ২০০৪ প্রকাশিত প্রচারপত্র থেকে,সংকলিত॥

## এইচডব্লিউএফ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

১৭ আগষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বর্ণা চাকমা এতে সভপতিত্ব করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা, পাহাড়ি যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার নেতা মনোরঞ্জন চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক ক্যহোচিং মারমা ও পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি পুলক চাকমা। এছাড়া, শোক প্রস্তাব পাঠ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কণিকা দেওয়ান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাবনা ত্রিপুরা।

কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন করা হয়। পরে এইচডব্লিউএফ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা খাগড়াছড়ি জেলা শাখার খসড়া নতুন কমিটি উপস্থাপন করলে প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন দেন। নতুন কমিটি ১৭ সদস্য বিশিষ্ট। সুমনা চাকমাকে সভাপতি, কণিকা দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক ও রিনা দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সোনালী চাকমা।

কাউন্সিল শেষে বিকেলে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

# ভিন দেশ

## আফ্রিকার হীরক যুদ্ধঃ নিজেদের সম্পদ যখন অভিশাপ

রবিশংকর চাকমা

*মূল্যবান খনিজ সম্পদের সাথে সম্পর্কিত এ সব সমস্যা দেখে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট একদা বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তানজানিয়ায় হীরা, সোনা, রূপা কিংবা তেল নেই।"*

অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকা। এর নাম শুনলেই যুদ্ধ, জাতিগত সহিংসতা, শরণার্থীর ঢল, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। আফ্রিকার অনেক দেশে এখনো চলছে যুদ্ধ বিগ্রহ। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর এই মহাদেশের অধিকাংশ দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত দানা বাঁধতে থাকে। ষাটের দশকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (পুরোনো নাম জায়ার), নাইজেরিয়া ও সুদানে বড় আকারের সংঘাত শুরু হয়। সত্তর দশকে ইথিওপিয়া, এ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে ভয়াবহ যুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯৮০র দশককে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধের দশক বলা যায়। কারণ এই সময়ে কমপক্ষে সাতটি স্বাধীন দেশ হয় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অথবা যুদ্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৯০ দশকে শান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিয়োন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের তালিকায় যুক্ত হলে সে সম্ভাবনা নাকশ হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে আফ্রিকার ৫৩ টি দেশের মধ্যে ১৪ টি দেশ রাষ্ট্রাভ্যন্তর যুদ্ধে (Intra-state conflict) জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান দশকের প্রথম দুই বছর কঙ্গো, সুদানসহ বহু দেশে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সব যুদ্ধের ফলে সেসব দেশে ব্যাপকভাবে মানবিক ও উন্নয়ন সমস্যা দেখা দেয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম - এই সমস্যা সংকুল মহাদেশের সর্বত্র শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আর্তনাদ ধ্বনিত হতে থাকে। সারা বিশ্বে রয়েছে ২২ মিলিয়ন শরণার্থী। এর মধ্যে কেবল আফ্রিকায় ৮ মিলিয়ন। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে বহু লোক মারা যায়।

আফ্রিকার এসব দেশে যুদ্ধের প্রধানতম কারণ হলো "মহামূল্যবান রত্ন" হীরা। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ১. ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম ও অরক্ষিত রাষ্ট্রীয় সীমানা, ২. শাসক গোষ্ঠির গৃহযুদ্ধ-প্রবণ রাজনীতি, ৩. দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ দারিদ্র্য, ৪. নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিভাজন এবং ৫. নব্য উপনিবেশবাদী হস্তক্ষেপ। আফ্রিকার দেশগুলোর যুদ্ধের প্রকৃতি হলো এই সব যুদ্ধ দেশাভ্যন্তরে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ - এক দেশের সাথে অন্য দেশের নয়, যদিও এক দেশের গৃহযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক অনেক সময় বিদ্রোহী গ্রুপকে সাহায্য সমর্থন দেয়ার নজীর রয়েছে। আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপকহারে শিশুদেরকে যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহার।

আমেরিকা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম হীরা ক্রেতা দেশ। আফ্রিকার এই দেশগুলোতে যে হীরা উত্তোলিত হয় তা বহু হাত ঘুরে আমেরিকার ম্যানহাটনের সুশোভিত প্লাজায় শোভা পায়। লাভজনক এই ব্যবসা সবচেয়ে বিপজ্জক, লোভী ও ধুরন্ধর ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরকে আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবসার সাথে এমনকি অনেক রাষ্ট্র প্রধানও জড়িয়ে পড়েছে যাদের বিরুদ্ধে এই মূল্যবান ধাতুর বিনিময়ে যুদ্ধে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। হীরক-যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যাদের নাম শোনা যায় তারা হলেন লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট চার্লস টেইলর, টোগোর নেতা গ্লাসিংবি ইয়াদেমা, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফি। লুণ্ঠিত হীরার লোভের বশবর্তী হয়ে ছয়টি দেশ কঙ্গোতে সৈন্য প্রেরণ করে। এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে লরা কাবিলার সরকারকে রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠায়, অপরদিকে বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা ও উগান্ডা তার সরকারকে উৎখাতে বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করতে সৈন্য প্রেরণ করে।

শীতল যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার এ্যাঙ্গোলার ইউনিটা বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয়। জোনাস সাবিমবি'র নেতৃত্বাধীন এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বহু বর্বরতার অভিযোগ রয়েছে। শীতল যুদ্ধের পর ইউনিটা আমেরিকার কাছে তার গুরুত্ব হারায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইউনিটার গেরিলা নেতা সাবিমবি ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজয় বরণ করলে তিনি জঙ্গলে ফিরে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে পুনরায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে স্বীকৃতি দেয়। তার গেরিলারা কুয়াঙ্গো নদীর অববাহিকার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এই অঞ্চলটি ডায়মন্ড সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে খ্যাত। এর নিয়ন্ত্রণ ইউনিটাকে আফ্রিকার সবচে' ধনী গেরিলা গ্রুপের পরিচিতি এনে দেয়।

১৯৯৬ সালে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কেতোকা ডায়মন্ড খনি হাতছাড়া হলে ইউনিটা গেরিলারা আশেপাশের অঞ্চলে অবস্থান নেয় ও গেরিলা যুদ্ধের নামে সন্ত্রাস কায়েম করে। তারা ৫৬ হাজার বেসামরিক লোককে নিজ বাড়ি থেকে উৎখাত করে। তাদের অধিকাংশই গরীব। তাদের পুঁতে রাখা ভূমি মাইনের আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায় অথবা চিরতরে পঙ্গু হয়। ইউনিটার এ ধরনের কার্যকলাপের কারণে জাতিসংঘ ১৯৯৮ সালে তাদের ডায়মন্ড বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

নব্বই দশকটি ছিল এ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে বর্বরতম। ডায়মন্ড বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কেনা হয় অস্ত্র। গোলা হামলায় পাহাড়ি শহর কুইটো ও হুয়াম্বো মাটির সাথে মিশে যায়। ৫ লাখের অধিক লোক মারা যায়। ভূমি মাইনের আঘাতে ৯০ হাজার লোক পঙ্গু হয়। এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে ৪০ লাখ লোক গৃহহারা ও ১০ লাখ লোক বিদেশী খাদ্য সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়।

**কঙ্গো**

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো হলো আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। আগে এর নাম ছিল জায়ার। এখানে রয়েছে চারটি বড় জাতিসত্তা ও দু'শরও বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর আন্তঃজাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতে দেশটি জর্জরিত হয়ে পড়ে। বহু লোক মারা যায়, খাদ্য সংকট তীব্র হয় ও দেশটি চরম বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হয়। কঙ্গোতে বহু মহামূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছেঃ যেমন,সোনা, তামা, ইউরেনিয়াম, হীরা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব সম্পদ দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়নি, বরং এসব সম্পদ দেশে সমস্যা ও যুদ্ধেরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের জন্য এই সম্পদ যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতার আগে বেলজিয়াম দেশটির সম্পদ ইচ্ছেমত শোষণ করে নিয়ে যায়। ১৯৫০ এর দশকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৬০ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। জোসেফ কাসাভুবু প্রেসিডেন্ট ও প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি অংশ বিদ্রোহ করে ও দক্ষিণের তামা-সমৃদ্ধ কাতাঙ্গা প্রদেশে মোইস সোমবিকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। জাতিসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেলজিয়াম সেখানে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও একটি একক রাষ্ট্র বজায় রাখার নামে সৈন্য প্রেরণ করে। পরে আমেরিকার চাপে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষি বাহিনী প্রেরণ করে। কাসাভুবু লুমুম্বাকে বহিষ্কার করলে লমুম্বা পালিয়ে যায়। পরে তাকে আটক ও হত্যা করা হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলে। কাসাভুবুর অধীনে সোমবিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে কাসাভুবু সোমবি-কে পদত্যাগে বাধ্য করলে সিআইএ সমর্থিত একটি সামরিক ক্যু সংঘটিত হয়। জোসেফ মবুতু ক্ষমতা দখল করে দেশটির নাম পরিবর্তন করে জায়ার রাখে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মবুতুকে স্বাগত জানায়।

মবুতু এ্যাঙ্গোলার এফএনএলএ বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে জোট বাধে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। দেশের অর্থনীতি হয়ে যায় পঙ্গু। অসংগতিত গেরিলারা দূরবর্তী এলাকায় খন্ড খন্ড গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তা দমন করা হয়। বন্দী গেরিলাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়। ১৯৭৭ সালে মবুতুর দুর্নীতি পরায়ন শাসনের বিরুদ্ধে আর একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। মবুতু ফ্রান্স, মিশর ও মরোক্কের সহযোগিতায় এই বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহীরা এ্যাঙ্গোলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

কঙ্গোর খনিজ সম্পদের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব হলো বৈমানিক প্রযুক্তিতে সেগুলো কাজে লাগে। সেজন্য গণতান্ত্রিক মুখোশ খুলে ফেলে পাশ্চাত্য সরকারগুলো সরাসরি সে দেশের খনিজ সম্পদ ও খনি শিল্পের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইএমএফ অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। এতে দেশটিতে আবার ঔপনিবেশবাদ ফিরে আসে এবং এত সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও দেশটি বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। ১৯৭৫ সালে এ্যাঙ্গোলা পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলে জায়ারের মাধ্যমে আমেরিকা ইউনিটা বিদ্রোহীদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। ইউনিটা সোভিয়েত সমর্থিত বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করছিল। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটু আগে বলা হয়েছে।

মবুতুর সীমাহীন দুর্নীতি সত্ত্বেও আমেরিকা ও বিশ্ব ব্যাংক তার সরকারকে সাহায্য দান অব্যাহত রাখে। ১৯৯১ সালে মবুতু একটি নতুন সংবিধান পাশ করে ও বহুদলীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। বিরোধী দল আত্মপ্রকাশ করে ও তার সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। মবুতু সহিংসতার মাধ্যমে এর জবাব দেয়। লুবুমবাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ এর অধিক বিক্ষোভকারী ছাত্রকে হত্যা করা হয়। বিরোধী দলগুলো একটি জোট গঠন করে মবুতুর পদত্যাগের আন্দোলন জোরদার করে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মবুতু নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আবার সেখানে সৈন্য পাঠায়। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকে সম্মান দেখানোর জন্য মবুতুর ওপর চাপ দেয়া হয়। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে সেনাবাহিনী মবুতুকে ক্ষমতাচ্যুত করে। লরা কাবিলা উগান্ডা ও রুয়ান্ডার সমর্থনে ক্ষমতায় আসীন হয়। সে দেশটির নাম জায়ার থেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে পুনরায় রূপান্তরিত করে ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে সে বিরোধী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিসকেদিকে গ্রেফতার করে। ১৯৯৪ সালে আট লক্ষ টটসি সংখ্যালঘু হত্যার জন্য দায়ি মিলিশিয়ারা কঙ্গোতে আশ্রয় নিলে রুয়ান্ডার সাথে কঙ্গোর ৫ বছর ধরে যুদ্ধ চলে। রুয়ান্ডা দুই বার কঙ্গোর অভ্যন্তরে আশ্রিত মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। এই যুদ্ধে অন্য ৫টি দেশ জড়িয়ে পড়ে ও ৩০ লাখ লোক মারা যায়। রুয়ান্ডা, উগান্ডা ও জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অভিযোগ, কঙ্গোতে তাদের হস্তক্ষেপের আসল উদ্দেশ্য হলো সে দেশের খনিজ সম্পদ ভান্ডার বিশেষত হীরা লুট করে নিয়ে যাওয়া। পরে যুদ্ধে জড়িত সবগুলো দেশ ও কঙ্গোর সব কটি গেরিলা গ্রুপ একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ক্ষমতা ভাগাভাগি করে একটি সরকার গঠিত হয়। এ বছর জুনের আগ পর্যন্ত ঠিকভাবে চলছিল। কিন্তু রুয়ান্ডা সমর্থিত আর.সি.ডি নামের একটি বিদ্রোহী গ্রুপের কমান্ডার কঙ্গোর সীমান্তশহর বুকাভু দখলে নিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। কঙ্গোতে বর্তমানে ১০ হাজার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষি বাহিনী রয়েছে।

**সিয়েরা লিয়োন**

সিয়েরা লিয়োন পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। ১৯৬১ সালে সে বৃটিশ উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ করে। স্বাধীনতার পর পরই ক্যু ও প্রতিক্যুর ফলে দেশটিতে অরাজকতা শুরু হয়। প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশটি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের উচ্চমানের হীরা উত্তোলিত হয়। কিন্তু সেগুলো জনগণের কোন কাজে লাগানো হয় না। সেখানে দুর্নীতি পরায়ন সরকার ও রেভ্যুলুশনারী ইউনাইটেড ফ্রন্ট (আরইউএফ) গেরিলাদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ চলছে (১৯৯৯ সালে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি ও জাতিসংঘ বাহিনী নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও) তা হলো হীরা খনির ওপর দখলকে কেন্দ্র করে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও ধর্ষণ, অত্যাচার, খুন ইত্যাদির প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। তাদের আদর্শের কোন বালাই নেই।

গৃহযুদ্ধে সাড়ে ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। কম পক্ষে ৫০ হাজার লোক মারা যায় ও এক লক্ষ লোক পঙ্গুত্ব বরণ করে। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে ও অবকাঠামো বিধ্বস্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট আহমেদ তেজান কাবা'র ১৫ বছরের শাসনামলে জনগণের উন্নতির জন্য কোন কাজ হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সরকার আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে ও কানাডা, বেলজিয়াম, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাইনিং কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করার বৈধতা লাভ করে। চারটি কোম্পানি - Global Exploration Corporation, Rex Mining Corporation, Diamond Works ও Sierra Tutile Nord Resources - নিজেদের মধ্যে পুরো দেশটি ভাগাভাগি করে নেয়। সিয়েরা লিয়োনের গৃহযুদ্ধে মাইনিং কোম্পানিগুলোর ভূমিকা সুবিদিত। ১৯৯৯ সালে সরকার ও গেরিলাদের মধ্যে টোগোর রাজধানী লোমে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোম্পানিগুলোর মধ্যে সরকারের কাছ থেকে ডায়মন্ড কনসেশন কেনা বা নবায়ন করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বর্তমানে সিয়েরা লিয়োনে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। চুক্তি মোতাবেক গেরিলা নেতা ফোদয় সঙ্ক সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এর পদ গ্রহণ করেন। পরে সরকার ও জাতিসংঘ বাহিনীর সাথে তার বনিবনা না হলে তিনি আবার তার গেরিলা ঘাঁটিতে ফিরে যান। সেখানে শান্তি এখনো সুদূর পরাহত।

**সুদান**

খুব সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অভিযোগ করেছে যে, তেল কূপ খননের জন্য দক্ষিণ সুদানে হাজার হাজার কৃষককে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হয়েছে। এজন্য সংগঠনটি সুদান সরকার ও তেল কোম্পানিগুলোকে দায়ি করেছে।

সংগঠনটির ৭৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে উক্ত অভিযোগ করা হয়। সুদানের ২০ বছর ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধে তেলের ভূমিকা অনুসন্ধান করে রিপোর্টে বলা হয়, তেল কূপ খননের সাথে সরকারী বাহিনী ও সরকারী মদদপুষ্ট মিলিশিয়া কর্তৃক জনগণের ওপর হামলার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তেল কোম্পানিগুলো যাতে তেল উত্তোলন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে লোহিত সাগরের পোর্ট সুদানে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য হাজার হাজার লোককে উৎখাত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তেল উত্তোলন সুদান জনগণের জন্য আনন্দের কারণ হওয়ার বদলে তা তাদের জন্য দঃখই নিয়ে এসেছে। কারণ সরকার তেলের টাকা অস্ত্র কেনার জন্য খরচ করে। "সুদানে কর্মরত বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো এইসব উচ্ছেদ, মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের সাথে জড়িত" বলেছে মানবাধিকার সংগঠনটি। বর্তমানে কেনিয়ায় সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যে শান্তি আলোচনা চলছে সেখানে দক্ষিণাঞ্চলের তেলের মজুত আহরণ হলো একটি প্রধান বিষয়। দক্ষিণাঞ্চল ভিত্তিক গেরিলা দল সুদান পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি উত্তরাঞ্চল ভিত্তিক সরকারকে তাদের এলাকার তেল উত্তোলনের অধিকার দিতে নারাজ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, তেল কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম সরকারের ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে এত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত যে, সংগঠনটি দাবি জানিয়েছে যাতে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো সুদানে তাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখে।

**শেষ কথা**

মূল্যবান খনিজ সম্পদের সাথে সম্পর্কিত এ সব সমস্যা দেখে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট একদা বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তানজানিয়ায় হীরা, সোনা, রূপা কিংবা তেল নেই।" আসলে যে সব দেশে দায়িত্বের সাথে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হয় যেমন বতসোয়ানা, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা নামিবিয়া, সেখানে এ সব সম্পদ উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখতে পারে। আর যেসব দেশে সরকারগুলো দুর্নীতিপরায়ণ, বিদ্রোহীরা দয়ামায়াশুন্য ও সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানা নেই যেমন এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, সিয়েরা লিয়োন, সেখানে চক চক করা মহামূল্যবান রত্নগুলো দাস-শ্রম, খুন, পঙ্গুত্ব, গণহারে বাস্তুচ্যুতি ও অর্থনীতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

স্ট্যান্ডফর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও The Paradox of Plenty এর লেখক টেরি লিন কার্ল (Terry Lynn Karl) বলেন, "হীরা কোন শয়তান নয়। যা দরকার তা হলো এসব সম্পদ আহরণের আগে দেশে একটি ভালো সরকার ও সম্প্রীতি।" আর তা না হলে জনগণের সম্পদই নিজেদের অন্তহীন দুঃখ ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। □

# শেষের পাতা

## সেনাবাহিনী কর্তৃক পিসিপি সভাপতি হয়রানির শিকার: খাগড়াছড়িতে প্রতিবাদ

গত ৪ জুলাই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিঠুন চাকমা ও তার সহকর্মিরা মাইসছড়ির যাত্রী ছাউনিতে গাড়ির অপেক্ষা করছিলেন খাগড়াছড়ি আসার জন্য। তখন দুপুর আনুমানিক ১২টা। এমন সময় সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি সেখানে এসে থামে। গাড়ির নাম্বার হলো ০৩০২২৫ ও ০৫৭২০০। সেনারা গাড়ি থেকে নেমে তাদের ঘিরে ফেলে ও অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এমনকি সেনারা পিসিসি সদস্যদের ভিডিও করে। মিঠুন চাকমা ও অন্যান্যরা এর প্রতিবাদ করলে সেনা কমান্ডার মেজর আলম তৎক্ষণাৎ তাদের সাথে তর্ক বিতর্কে লেগে যায়। কিন্তু তর্কযুদ্ধে পেরে না উঠে তিনি চোখ মুখ লাল করে তার সৈন্যদের নিয়ে চলে যান। পিসিপি নেতাকর্মিদের তিনি হেনস্থা ও অপমানিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ বেলায় তিনিই নিজে তার সৈন্যদের সামনে অপমানিত ও তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

পরে পিসিপি সদস্যরা খাগড়াছড়ি ফিরে এসে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পিসিপি জেলা সভাপতি স্বপন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে জেলা সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা, রাজশাহী শাখার সভাপতি সুনির্মল চাকমা (জিম্পু) এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান বক্তব্য রাখেন। মিঠুন ও তার পিসিপি'র সহকর্মিরা সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসেবে মাইসছড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে ছাত্রদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করার পর তারা ঐদিন খাগড়াছড়ি ফিরছিলেন।

ইদানিং ইউপিডিএফ ও তার সহযোগি সংগঠনগুলোর গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও হয়রানি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জুন মাসে রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন ইউপিডিএফ এর অফিস উদ্বোধনে মরিয়া হয়ে বাধা দেয়। সেখানে যাতে ইউপিডিএফ এর অফিস না হয় সেজন্য জোন কমান্ডার ইকরামুল ইয়াসিনের নেতৃত্বে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন নানা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, ও হুমকির আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ ১৫ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস উদ্বোধন ও ২০ জুন গণসমাবেশের আয়োজন করে। এরপরও সেনাবাহিনী ইউপিডিএফ এর অফিস বন্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের অশুভ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

## ইউপিডিএফ সদস্য জ্ঞান চাকমাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষ্মীছড়ি থানা সদরে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ সদস্য জ্ঞান চাকমাকে গত ২২ জুলাই গ্রেফতারের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ২৩ জুলাই বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও পরে শহীদ মিনার চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা শান্তিদেব চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সুপার জ্যোতি চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা দেবাশীষ চাকমা, সর্বোত্তম চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার নেতা চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা ও পাহাড়ি যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি অপু চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অতীতের মতো বর্তমানেও সেনাবাহিনী অপারেশন উত্তরণের নামে নিরীহ পাহাড়ি জনগণের উপর ব্যাপক ধরপাকড়, হয়রানি, নিপীড়ন নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। ইউপিডিএফ এর গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে আসছে। বক্তারা অবিলম্বে জ্ঞান চাকমার মুক্তি এবং অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করে সেনাবাহিনীর এহেন আচরণ বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। অন্যথায় ইউপিডিএফ জনগণকে সাথে নিয়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলবে বলে বক্তারা সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

## গরগজ্যাছড়িতে সেনা তল্লাশীর নামে হয়রানি, বৌদ্ধ বিহার তছ্‌নছ্‌

খাগড়াছড়ির জেলা সদরের গরগজ্যাছড়ি গ্রামে সেনাবাহিনী পর পর দু'বার তল্লাশীর নামে জনগণকে ব্যাপক হয়রানি ও বৌদ্ধ বিহার তছনছ করেছে।

জানা যায়, গত ২ আগষ্ট সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ৫ম বেঙ্গলের সেনা সদস্যরা প্রথমবারের মত গরগজ্যাছড়ি গ্রাম ঘেরাও করে। সেনারা তল্লাসীর নামে নিরীহ জনগণকে হয়রানি করে ও ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারও তছনছ করে দেয়। তারা দরজা জানালা ভেঙে বিহার অধ্যক্ষের রুমে প্রবেশ করে, আলমারির তালা ভেঙে ফাইল, কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যায়। বিহারের সমস্ত জিনিসপত্র তল্লাশীর নামে তছনছ করে দেয়। এমনকি পার্বত্য বৌদ্ধ মিশন থেকে দেয়া ওধষপত্রও নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বিহার অধ্যক্ষের কাছ থেকে বিহারের কোনকিছু ক্ষতি করা হয়নি মর্মে একটি লিখিত পত্রও নিয়ে যায়।

এই ঘটনার দু'দিন পর ৪ আগষ্ট বিকেল তিনটার দিকে আর এক দফায় সেনারা হানা দেয়। এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যের সাথে ৪ জন জনসংহতি সমিতির সদস্য আর্মি ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় ছিল। তারা তল্লাশী অভিযানে সেনাবাহিনীকে সরাসরি সহযোগিতা করছিল। জেএসএস এর এই সদস্যরা হলো, ডিকো চাকমা, জগদীশ চাকমা, বসন্ত চাকমা ও চাইলা চাকমা। এই দ্বিতীয় দফা হয়রানির সময়ও গরগজ্যাছড়ির অধিকাংশ ঘরবাড়িতে তল্লাশী চালানো হয়। জেএসএস সদস্যদের অঙ্গুলী নির্দেশে সেনাবাহিনী দুই জন নবম শ্রেণীর ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এরা হলো ত্রিপন চাকমা (১৭) পিতা সুশীল জীবন চাকমা ও নতুন চাকমা (১৭) পিতা ধন চাকমা। এর মধ্যে নতুন চাকমা মানিকছড়ির বাসিন্দা। উভয়েই কমলছড়ি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

গ্রেফতারের পর এলাকার মুরুব্বীদের চাপে বিজিতলা বাজার থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে পরদিন বিজিতলা ক্যাম্পে বিকেল তিনটায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়।

সেনাবাহিনী ও জেএসএস এর মধ্যে যৌথ সন্ত্রাসের মহড়া নতুন কোন বিষয় নয়। আত্মসমর্পনের পর থেকে জেএসএস সরকারের আশ্রিত একটি দলে পরিণত হয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনীর সেবা করা ছাড়া জেএসএস আর তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। তাদের এ অবস্থা নির্বাচনের সময়ও বোঝা যায়। জেএসএস নির্বাচনে কখনো আওয়ামী লীগ ও কখনো বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। বিনিময়ে সরকারে গিয়ে এই দুইটি দলের থেকে জেএসএস নানা ধরনের সুবিধা পেয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জেএসএস কোনদিনই তার পার্টিগত পলিসি ঠিক করতে পারেনি।

বর্তমানে জেএসএস আঞ্চলিক পরিষদের টিকে আছে বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যে। অবশ্য এই দয়া দাক্ষিণ্য নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন নয়। সরকার জেএসএস-কে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে কারণ সরকার জেএসএস এর কাছ থেকে এর বিনিময়ে সার্ভিস পাচ্ছে। আর এই সার্ভিস হলো জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করা, জনগণকে বিভ্রান্ত করা। যে কাজ আগে সরকারের দালালরা, বিভিন্ন আঙ্গুল বাহিনী, গপ্রক বাহিনী করতো, এখন সে কাজই জেএসএস করে দিচ্ছে। এবং তা করছে কোন প্রকার বিবেকের দংশন ছাড়া। ইউপিডিএফ এর সাথে ঐক্য ও সমঝোতায় না যাওয়ার কারণও হলো এটাই।

## পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ ও ৯ জুলাই দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মিঠুন চাকমা। সভার শুরুতে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং খসড়া কর্মসূচী পেশ করেন। এরপর উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ খসড়া প্রস্তাবের উপর তাদের মতামত পেশ করেন। তারা সম্প্রতি সেনাবাহিনী কর্তৃক পিসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে বাধা প্রদান ও গোপনে নেতৃবৃন্দের ভিডিও চিত্র ধারণকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে উল্লেখ করে সেনাবাহিনীর এহেন অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানান।

সভায় পিসিপির শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবিনামার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির প্ররোচনায় তরুণ প্রজন্ম আজ চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন বলে মতামত প্রকাশ করেন এবং একমাত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনার মধ্য দিয়ে সামাজিক পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে যুব সমাজের অবক্ষয় রোধ করার দৃপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নেতৃবৃন্দ জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিহার করে, সরকারী সুযোগ সুবিধা ও আঞ্চলিক পরিষদের গদি ছেড়ে বৃহত্তর ঐক্যের মাধ্যমে জাতিসত্তার মুক্তির আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য জেএসএস তথা সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান। বর্ধিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বক সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## সেনাবাহিনী কর্তৃক কুদুকছড়িতে ২ ইউপিডিএফ কর্মি গ্রেফতার

স্বাধিকার॥ ৮ আগষ্ট সকাল সাতটার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইউপিডিএফ এর দুই সদস্যকে কুদুকছড়ি বাজার থেকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন উত্তম চাকমা ও নয়ন চাকমা।

কি কারণে তাদেরকে ধরে নেয়া হয়েছে তা সেনা সদস্যরা জানায়নি। তাদের বিরুদ্ধে এর আগে কোন মামলা ছিল ছিল না।

গত জুন-জুলাই মাসে নান্যাচরে জোর করে ইউপিডিএফ অফিস বন্ধ করে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে সেনা সদস্যরা সন্ত্রাসী ধরার নামে নিরীহ ইউপিডিএফ সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি ও গ্রেফতার করছে।

## গামাট্যাঢালা ইউপি চেয়ারম্যানকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র

গত ৮ জুলাই ২০০৪ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩/৪টার দিকে গামাট্যাঢালা গ্রামে ১ নং খাগড়াছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রীতিবিন্দু দেওয়ান এর বাড়ির পাশে দুইজন সেটলারকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। এর পর পরই একই দিন রাত সাড়ে আটটায় একদল সেনাবাহিনীর সদস্য তার বাড়ি ঘেরাও করে এবং প্রীতি বিন্দু চাকমার বাড়ির পাশে ফুলের বাগান থেকে অচল অবস্থায় একটি এলজি ও দুই রাউন্ড গুলি "উদ্ধার" করে। সেনারা চেয়ারম্যানকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে চলে যায়।

বাড়ির পাশে সেটলার ঘোরাঘুরি করা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক হঠাৎ করে গিয়ে বন্দুক গুলি উদ্ধার করার ঘটনায় এলাকার জনমনে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এলাকার জনগণ মনে করছেন গামাট্যাঢালার সেটলারদের দ্বারা পাহাড়ি জমি বেদখল প্রচেষ্টায় বাধা দেয়ার কারণে তাকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উক্ত "অস্ত্র উদ্ধার" নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে গামাট্যাঢালার সেটলাররা পাহাড়িদের মালিকানাধীন কিছু জায়গা দখল করতে চাইছে। তারা প্রথমে ইউপি চেয়ারম্যান প্রীতিবিন্দু চাকমার কাছ থেকে অনুমতি চাইতে যায়। কিন্তু তিনি এ ধরনের বেআইনী কাজে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বাধা দেন। পরে সেটলাররা তার কথা অমান্য করে বসত নির্মাণের জন্য জঙ্গল কাটা শুরু করে দেয়। চেয়ারম্যান ও এলাকার মুরুব্বীরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইলে প্রশাসন সেটলারদের জঙ্গল কাটা বন্ধ করে দেয়। এর পর মাইসছড়ি জোন কমান্ডারও পাহাড়ি মুরুব্বী ও সেটলারদের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দেন। অর্থাৎ সেটলাররা পাহাড়িদের জমিতে বাসা বাড়ি করতে পারবে না বলে তিনি রায় দেন।

বর্তমানে এই জায়গা নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। সেটলাররা ঐ জায়গার দখল পাওয়ার জন্য জনৈক পাহাড়ি মুরুব্বীকে দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছে বলে জানা গেছে। তবে উক্ত মুরুব্বী ঘুষ নিয়ে একটা অন্যায় ও বেআইনী কাজে অংশীদার হতে চাননি। তিনি তাদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেন। গামাট্যাঢালার পাশে বিজিতলা ক্যাম্পকে এখন সাবজোনে উন্নীত করা হচ্ছে। লোকজনের আশঙ্কা সাবজোন হলে সেটলাররা কোন জুম্ম বিদ্বেষী সেনা কমান্ডারের সহযোগিতায় জোর করে পাহাড়িদের জমি বেদখল করতে পারে।

## চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

গত ১০ জুলাই ২০০৪ খাগড়াছড়ি সদর মহিলা কলেজের পাশে ৬ তলা বিশিষ্ট টিটিসি ভবন নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত দুটি পাম্প মেশিন চুরি হয়ে যায়। কমলছড়ির কিছু সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই চুরির ঘটনার সাথে জড়িত। গ্রামের মুরুব্বী ও স্থানীয় ইউপিডিএফ নেতাদের তৎপরতার কারণে চোররা ধরা পরে ও মেশিনগুলো বের করে দিতে বাধ্য হয়। মোট ৯ জন চোরের মধ্যে ৩ জন ধরা পড়ে। তাদেরকে গ্রাম্য শালিসে শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ এ ধরনের কাজ আর ভবিষ্যতে করবে না এই শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। অবস্থা টের পেয়ে বাকি ৬ জন চোর মহালছড়িতে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এটা দেখে সাধারণ জনগণ বলাবলি করছে চোর চোরের কাছেই তো আশ্রয় নেবে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। কোন সৎ লোক বা ভালো কোন সংগঠন সমাজের চোর বদমাশদের আশ্রয় স্থল হতে পারে না।

জানা গেছে, জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা এখন এই চোরদেরকে আরো বেশি জঘন্য ও অসৎ কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

## মহালছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন আটক

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৩ জুলাই গভীর রাতে মাইসছড়ি সাব-জোনের এক দল সেনা সদস্য মহালছড়ির বাবুপাড়ায় হানা দেয়।

সৈন্যরা এ সময় ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের জাগিয়ে বাড়িঘরে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। পরে তারা উলাঅং মারমা নামে ২০ বছরের এক যুবককে ধরে নিয়ে যায়। তার বাবার নাম দোঅং মারমা। সেনারা পরদিন তাকে মহালছড়ি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কি কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানানো হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তাকে গত বছর ২৬ আগষ্ট সংঘটিত মহালছড়ি ঘটনার পর পাহাড়িদের বিরুদ্ধে সেটলারদের দায়ের করা মিথ্যা মামলার সাথে তাকে জড়ানো হতে পারে।

## ইউপিডিএফ নান্যচর অফিস ষড়যন্ত্র মামলা: ইউপিডিএফ এর পক্ষে আদালতের রায়

গত ২৫ জুলাই ২০০৪ ইউপিডিএফ এর নান্যাচর অফিস বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় রায় ঘোষণা করা হয়েছে। রাঙ্গামাটির জেলা আদালত ইউপিডিএফ এর পক্ষে এ রায় দেন।

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ এর নান্যাচর ইউনিট অফিসটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য সেনা প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে ষড়যন্ত্র করে আসছে। প্রথমে তারা নিজেরাই ইউপিডিএফ এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে হুমকি ধামকি দিয়ে অফিসটি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনী টিএনও-এর চাপ দিয়ে সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে অফিস বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। তাদের সে চেষ্টাও সফল হয়নি। পরে ২৯ জুন রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক স্বয়ং ইউপিডিএফ নান্যাচর অফিসটি সরিয়ে নেয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ দেন। ধারণা করা হয় তিনি সেনা অফিসারদের চাপে এ নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইউপিডিএফ জেলা প্রশাসকের এ আদেশের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটিতে আদালতে মামলা দায়ের করে। ইউপিডিএফ এর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট দুলাল কান্তি সরকার।

এর পরও সেনা প্রশাসনের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তারা এখনো ইউপিডিএফ এর অফিস বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র ও ইউপিডিএফ-কে নানাভাবে ক্ষতি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯